নাটাই ঘুড়ি

নাটাই ঘুড়ি

মৌলী আখন্দ

তাম্রলিপি

নাটাই ঘুড়ি
মৌলী আখন্দ

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

তাম্রলিপি: .....

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
.....

বর্ণ বিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
.....

মূল্য: .....

Natai Ghuri
By: Moulee Akhund
First Published: ....., by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100.
Price: 00
ISBN : .....

উৎসর্গ

শেখ গোলাম কিবরিয়া তারা

মনিরুন্নেসা রনি

দ্বিতীয় বাবা

দ্বিতীয় মা

যারা আমাকে জন্ম দেননি, শৈশবে লালনপালনও করেননি কিন্তু সংসার অনভিজ্ঞ একটি অবুঝ মেয়েকে যারা আপন করে নিয়েছিলেন গভীর ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে। যাদের কাছে প্রতিনিয়ত শিখছি দায়িত্ববোধ; কোনো কিছুর আশা না করেই সন্তানের পাশে থাকার অদ্ভুত নিদর্শন। আমার জীবনসঙ্গীর পাশে থাকার বিয়ে নামের পবিত্র প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যাদের পেয়েছি দ্বিতীয় বাবা ও দ্বিতীয় মা হিসেবে। যারা আমাকে আগলে রেখেছেন যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে। স্রষ্টার কাছে যাদের ভালো থাকার জন্য প্রার্থনায় আমার দুটি হাত মোনাজাতে রত হয় প্রতিনিয়ত। কোনো অঙ্গীকার না করেও যারা আমাকে দিয়ে গেছেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। যাদের ঋণ শোধ করতে অক্ষম এই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ আমি। যারা কখনো বা হয়েছেন দুঃখের সময়ের আশ্রয়, আবার কখনো সুখ উদযাপনের আশীর্বাদের উৎস। ভালো থাকবেন আমার দ্বিতীয় আব্বু ও আম্মু।

গল্পের পেছনের গল্প

গত বছরের শরতের শুরুতে যখন কাশফুল ফুটি ফুটি করছিল, বাতাসে উড়ে উড়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো শিমুল তুলা, ঠিক তখনই আমাকে আক্রমণ করেছিল তীব্র বিষাদ। যে বিষাদের সাথে পরিচয় আমার নতুন নয়। যে আমার পুরনো সঙ্গী, ভুলতে চাইলেও যে আমাকে ভুলতে চায় না, কিছুটা দূরে চলে গেলেও পুরোপুরি ছেড়ে চলে যায় না।

অনেক দিন ধরে কিছু লিখতেও পারছিলাম না, পড়তেও পারছিলাম না। এমন সময়ের জন্য একটা প্রচলিত উপদেশ হচ্ছে, যারা তোমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে, তাদেরকে দেখো কিংবা তাদের কথা ভাবো– দেখবে ভালো লাগবে।

সেই উপদেশ মানতেই এমনই এক অস্থির সময়ে আমি গিয়েছিলাম ঢাকার অদূরে এক শহরতলিতে, নিজের চেনা গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে কিছুটা সময় কাটাতে। না কোনো ট্যুরিস্ট স্পট কিংবা ভ্রমণকেন্দ্র নয়, এমনকি পরিচিত কোনো জায়গাতেও নয়।

আমি গিয়েছিলাম এক সাধারণ শহরতলির নিম্নবিত্ত এক পাড়ায় তাদের জীবন যাপন দেখতে। সেখানে গিয়ে আমার সাথে দেখা হয়েছিল এক নারীর।

যার উত্তাল যৌবন, প্রবল সংসারবোধ, কিন্তু নেই কোনো নিজস্ব সংসার। বোনের সংসার সামলাতে সামলাতেও যার ভেতরের বুনো সৌন্দর্য নিজেকে গোপন করে রাখতে পারছে না, উপচে উপচে পড়ছে যার বুনোফুলের মতো সৌন্দর্য।

সেই পাড়ার পথ দিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমার দৃষ্টিকে গ্রেফতার করে নিয়েছিল সেই নারী। কেমন এক অদ্ভুত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি হয়ে পড়েছিলাম মোহাবিষ্ট। আমি

সরতে পারছিলাম না তার সামনে থেকে– তাকে কেন যেন খুব পরিচিত মনে হচ্ছিল।

কোথায় দেখেছি আমি এই নারীকে? আচমকা মনে পড়ে গেল– ঠিক এই নারীকে আমি দেখিনি, কিন্তু এই রকম নারীর কথা আমি এর আগে পড়েছি।

'পদ্মা নদীর মাঝি'র কপিলা কিংবা *'পুতুল নাচের ইতিকথা'র* কুসুমের সাথে কোথায় যেন খুব বেশি মিল আছে ছিলা টানটান ধনুকের মতো এই নারীর। আমি মনোযোগ দিয়ে তার বোনের দু-কামরার সংসার সামলানো দেখলাম, তার উঁচু করে বাঁধা চূড়োখোঁপা দেখতে দেখতে আমার ভেতরে গল্প চলে এল, বাঁধভাঙা স্রোতের মতো। জন্ম হলো আমার *'নাটাই ঘুড়ি'*র রুম্পার।

সেদিন গভীর রাতে গল্পটা লিখতে শুরু করলাম আমি। তীব্র আনন্দে শরীর কাঁপতে লাগল আমার।

তবে এই গল্প শুধু রুম্পার নয়, এই গল্প মীরার, এই গল্প নীরার, এই গল্প শিহাবের, এই গল্প মুশফিকের, এই গল্প ইমরুলের, এই গল্প নাইমার, এই গল্প রিম্মির। *'নাটাই ঘুড়ি'* জীবনের গল্প। প্রেম, ভালোবাসা, তীব্র বিষাদ কিংবা প্রবল আনন্দের দোলাচলে দুলতে থাকা সব অনুভূতির আখ্যান এই *'নাটাই ঘুড়ি'*।

লেখালেখি করবার সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপারটা হলো নতুন এক জগত সৃষ্টির আনন্দ। যে তীব্র আবেগ, যে অসম্ভব আনন্দ নিয়ে আমি *'নাটাই ঘুড়ি'* লিখেছি, তার সামান্য অংশও যদি আমার পাঠককে স্পর্শ করে, তবেই আমি নিজেকে সার্থক বলে মনে করব।

মৌলী আখন্দ
১৯শে ভাদ্র
১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

ভোর ছ'টায় যখন দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়, আম্মু দরজা খুলে দুধ নেয় গোয়ালার কাছ থেকে। তখন মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় মীরার। আজকেও ভেঙে গেল।

মীরার সাথে শোয় তার চাচাত বোন নীরা আপু। বড় চাচার মেয়ে।

সাবধানে ওর গায়ে কাঁথা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে নেমে এল মীরা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল নীরা আপুর ঘুমন্ত সুন্দর মুখের দিকে।

মীরার নামটা নীরা আপুর সাথে মিলিয়ে রাখা। যদিও নীরা আপুর সাথে কিছুমাত্র মিল নেই তার।

না চেহারায়, না স্বভাবে। নীরা আপু কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।

দারুণ সুন্দরী। একদম বড় চাচির মতো গায়ের রং, মুখটা পানপাতা শেইপের, কাটা কাটা নাকমুখের গড়ন, কেউ যেন নিখুঁত করে তৈরি করেছে।

কথার ঝালটাও সেইরকম। বড় চাচার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন দাদার ব্যবসার অবস্থা ছিল রমরমা।

প্রচুর যৌতুক এনে অবস্থাপন্ন ঘর থেকে মেয়ে আনা হয়েছিল বড় চাচার জন্য। আর মীরার আব্বুর বিয়ের সময় দাদার অবস্থা কিছুটা পড়ে গিয়েছিল।

তা ছাড়া মীরার আম্মু-আব্বুর মনে হয় বিয়ের আগেই কিছুটা ভাব ভালোবাসা হয়ে থাকবে। তাই মীরার আম্মুর বিয়েতে তেমন কোনো বাছাবাছি কিংবা যৌতুক আদায় করার সুযোগ পাওয়া যায়নি।

বড় ঘরের মেয়ে আগুন সুন্দরী বড় চাচির সামনে মাঝারি ঘর থেকে আসা মাঝারি চেহারার মীরা তাই আম্মুকে বরাবরই ম্রিয়মাণ থাকতে দেখেছে ছোটবেলা থেকেই। সে অবশ্য এসব কেয়ার করে না।

মীরা আম্মুর গায়ের রং পেয়েছে। স্বাস্থ্যও মোটার দিকে, চেহারাও কেমন চাকমা চাকমা ধরনের।

মীরার মুখটা কেমন গোল, মাঝে মাঝে তার মনে হয় নাকের ওপরে কম্পাস রেখে ঘোরালে নিখুঁত একটা সার্কেল হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ভেবেই হাসি পেয়ে গেল তার। ফিক করে হেসে ফেলল সে।

কানে এল দাদির কোরআন তেলাওয়াতের শব্দ। ফজরের নামাজ পড়ে সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত করেন দাদি। তারপর ইশরাকের নামাজ পড়েন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাদির কোরআন তেলাওয়াত শুনতে শুনতে বাইরে ভোরের আলো ফুটে ওঠা দেখতে লাগল মীরা। চায়ের কড়া লিকারে আস্তে আস্তে ড্যানিশ ঢেলে দিলে কুচকুচে কালো চা যেমন আস্তে আস্তে সুন্দর সোনালি রঙের হয়, অবিকল সেরকম ধীরে ধীরে নীলাভ আকাশটা ফরসা হয়ে উঠছে।

দাদা আর বড় চাচাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মসজিদ থেকে ফিরছেন। মীরা চট করে সরে এল পিলারের আড়ালে।

বড় চাচি এখনো বের হননি ঘর থেকে, আম্মু নাস্তা বানাচ্ছে ফুলিকে নিয়ে। ও এই বাসায় আছে গত ছয় বছর ধরে।

ছয় বছর আগে ওর খালার সাথে এক শীতের সকালে এই বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল ফুলি। তখন মনে হয় বয়স বারো কি তেরো ছিল।

ওর খালা নির্বিকার মুখে বলেছিল, ওর স্বামী নাকি ওকে নেয় না, দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। ছোট একটা বাচ্চা আছে দুই মাসের, তাকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছে।

তখন মীরাও ছোট, ক্লাস থ্রিতে পড়ে কেবল। অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে।

এই বাড়ির পেছনে একটু দূরে তখন একটা পুকুর ছিল। মীরা স্কুল থেকে ফিরে আসার পর ওকে সাথে নিয়ে দুপুরবেলা সেই পুকুরে নেমে ওর দিকে পেছন ফিরে ব্লাউজ আলগা করে স্তনে চাপ দিয়ে দিয়ে বুকের দুধ বের করে করে পুকুরের পানিতে ফেলে দিত ফুলি।

মীরা পুকুরে নামত না, পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকত পাহারায়। ফুলি তখন শাড়ি পরত।

মীরা তখন ছোট, তখন হালকা হালকা বুঝেছিল বিষয়টা। পুরোপুরি বুঝেছিল ওর ছোট ভাইটার জন্মের পর।

ফুলি আসার এক বছর পর জন্ম হয় ওর ছোট ভাই মাশুকের। ওর জন্মের পর দুই-তিন ঘণ্টা পরপর ঘরের এক কোনায় বসে বুকে নিয়ে ওকে খাওয়াত আম্মু।

আম্মুর শ্যামলা মুখটা তখন ভরে যেত অদ্ভুত এক আলোতে। তখন মীরা তার ছোট্ট মনে হিসেব মিলিয়েছিল ফুলির বুকের দুধ ফেলে দেওয়ার রহস্যের।

ফুলি বলেছিল, সন্তান কাছে না থাকলে বুকে যে দুধ জমে ওঠে, তা যেখানে সেখানে ফেলতে নেই। নদীতে ফেলা যায়, নদী না পেলে পুকুরে।

পরের বছর খবর এসেছিল ফুলির ছেলেটা মরেছে পানিতে ডুবে। নানির তত্ত্বাবধানে ছিল, হাঁটতে শেখার পর দুরন্ত ছেলে ডুবে মরেছে ওই পুকুরে ডুবেই।

মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেকেটে ছেলের বাবাকে শাপশাপান্ত করেছিল ফুলি। তারপর অবশ্য কেটে গেছে আরও চার বছর।

সবকিছুই বদলে গেছে অনেক। বাড়ির পেছনের পুকুরটা, যেখানকার পানিতে মিশে ছিল ফুলির বুকের দুধ, সেটা এখন আর নেই।

পুকুর ভরাট করে বিল্ডিং উঠেছে নতুন। বিল্ডিংটার উল্টো দিকে নতুন একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে 'ইস্টার্ন' নামে।

ইদের সময় মার্কেট থেকে হালফ্যাশনের জামা কিনে এনে পরে ফুলি। ছেলের কথা ওর মনে পড়ে কি না বোঝা যায় না।

ওইটার পাশে যে লোহার গেটওয়ালা পুরানো, জায়গায় জায়গায় রং উঠে যাওয়া ময়লা হলুদ রঙের দোতলা বিল্ডিংটা আছে, ওইটাই মীরাদের বাড়ি। বাড়ির নাম 'আমেনা মঞ্জিল'।

আমেনা মীরার দাদার মায়ের নাম। মীরাদের বাসায় থাকেন দাদা, দাদি, আব্বু, আম্মু, বড় চাচা, বড় চাচি, ছোট চাচা ও ফুপি।

পারফেক্ট যৌথ পরিবার। মীরার দাদার আগে অনেক টাকাপয়সা ছিল।

তখন বাসার সবার সাথে খুব হম্বিতম্বি করতেন। শেয়ারমার্কেটে বড় ধরনের লস খাওয়ার পর এখন ঝিম মেরে গেছেন।

এখন আর কোনো কিছুতেই দাদা কিছুই বলেন না। আব্বু আর চাচারা মিলে দাদার ব্যবসা দেখে।

বছরে একবার গ্রামের বাড়ি থেকে যখন চাল আসে, তখনো দাদার কোনো হেলদোল দেখা যায় না। অথচ আগে দাদা নিজেই দাঁড়িয়ে সব মেপে নিতেন।

আম্মু আর চাচিরাও এখন আর দাদিকে অত মানে না। আগে দাদির হুকুম ছাড়া কিছুই রান্না হতো না।

শহর থেকে তিন-চার ঘণ্টা দূরত্বে গ্রামের বাড়িতে দাদার ব্যবসা। পুকুরে মাছ ছেড়েছেন, মুরগির ফার্মে মুরগি।

ক্ষেতে বর্গা চাষিরা কাজ করে, আরও কী সব যেন। গিয়ে সবকিছু তদারকি করতে হয়।

দুই-একদিন পরপর খুব ভোরে আব্বু আর চাচারা চলে যায় অটোতে করে। মীরাদের বাসায় লোকজন অনেক, শোয়ার জায়গার খুব সমস্যা।

মীরার ছোট ভাইটা শোয় আম্মু-আব্বুর সাথে। নীরা আপুর বড় ভাই মুশফিক ভাইয়া ঢাকায় ওদের খালার বাসায় থেকে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে।

গত বছর মুশফিক ভাইয়া ঢাকায় চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছোট চাচা আর মুশফিক ভাইয়া এক রুমে থাকত। এখন ছোট চাচা একাই থাকেন ওনার রুমে।

পড়ালেখা শেষ, বিসিএসের পড়া পড়েন। ছোট চাচার সাথে কার যেন লাইন চলছে ইদানিং, মেয়েটার নাম খুব সম্ভব তিথি।

ছোট চাচা আজকাল ব্যাক ব্রাশ করে চুল আঁচড়ান, মুখে আফটার শেভ লোশন, গায়ে বডি স্প্রে মাখেন। গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে কেমন যেন অনীহা দেখান, টের পায় মীরা।

আলো ফুটে গেছে, আর দেরি করা যাবে না। নীরা আপুকে তুলে মীরার নিজেরও রেডি হতে হবে।

নীরা আপু সকালে অঙ্ক স্যারের বাসায় ব্যাচে পড়তে যায়, আপুর কলেজ নয়টা থেকে। মীরার স্কুল আটটা থেকে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে, মীরা গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল নীরা আপুকে। নীরা আপু স্যারের বাসায় পাঁচ মিনিট দেরি করে ঢুকলেও অসুবিধা নেই, মীরা অ্যাসেম্বলিতে দেরি করে ঢুকলে সমস্যা।

কাল সারাদিন একটু মেঘলা মেঘলা বৃষ্টি বৃষ্টি ছিল, ড্রেসগুলো পুরোপুরি শুকায়নি। তাই মাগরিবের পর ড্রেসগুলো বারান্দায় এনে শুকাতে দেওয়া হয়েছিল।

নীরা আপুকে বিছানায় মোচড়ামুচড়ি করতে দেখে মীরা কাপড়ের বালতি নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। দৌড়াদৌড়ি করে রেডি হতে হবে এখন, মোটেই সময় নেই।

এই ছোট্ট শহরে পূর্ব-পশ্চিমে একটা মাত্র বড় রাস্তা চলে গেছে আর উত্তর দক্ষিণ বরাবর তিনটা মাঝারি রাস্তা। বাকি সবই ছোট ছোট গলি।

মীরাদের বাসা থেকে বের হলে একটু দূরেই একটা লাকড়ির দোকান। সেখানে বড় দাড়িপাল্লায় মেপে লাকড়ি বিক্রি হয়।

আজকে স্কুলে যাওয়ার সময় টের পেল মীরা, ও পাশের বাড়ির শিহাব ভাইয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে গলির মাথায়। আজকাল দাঁড়িয়ে থাকে প্রায়ই।

কিছু কিছু দৃষ্টি অনুভব করা যায়। শিহাব ভাইয়ার দৃষ্টিটা মীরা অনুভব করতে পারে খুব করে।

শিহাব ভাইয়াদের বাসায় আগে খুব যাতায়াত ছিল ওদের ছোটবেলায়। মীরার আম্মুর সাথে আগে খুব সখ্য ছিল শিহাব ভাইয়ের আম্মুর।

খুব মনে আছে, ওদের ছোটবেলায় রোজার দিনে ইফতারের প্লেট, শীতের দিনের ভাপা পিঠার আদান প্রদান চলত। এক এক বাসার বুট বড়া পেঁয়াজুর স্বাদও খুব করে আলাদা হয়।

এক এক মায়ের হাতের রান্না আর বানানো পিঠাও হয় এক এক রকম! অন্য বাসার ইফতার আর পিঠার প্রতি তাই থাকত ভিন্ন রকম আকর্ষণ।

খুব ছোটবেলায় বৈশাখী মেলায় একসাথে যেত দুই বাসার বাচ্চারা; ইদের দিনে বেড়াতে যাওয়া হতো ওদের বাসায়। শিহাব ভাইয়াদের কোন চাচা যেন বিদেশে থাকতেন; তাই তাদের বাসার ফ্রিজে থাকত বিদেশি চকলেট।

বেড়াতে গেলে শিহাব ভাইয়া তার ভাগের বিদেশি চকলেট থেকে মীরাদেরও চকলেট দিত।

একদিন এক চৈত্র মাসের দুপুরে খাঁখাঁ রোদ্দুরে অফিস থেকে ফিরে এলেন শিহাব ভাইয়ের বাবা। আন্টি অবাক হয়ে অসময়ে অফিস থেকে ফেরার কারণ জানতে চাইলে বলেছিলেন, "শরীরটা খারাপ লাগছে। এক গ্লাস লেবুর শরবত দাও তো, সুরমা।"

এই দৃশ্য অবশ্য মীরা নিজের চোখে দেখেনি, শুনে শুনে কল্পনা করে নিয়েছিল। তার কল্পনাশক্তি মাশাল্লাহ ভালো।

আন্টি লেবুর শরবত নিয়ে ফিরে এসে দেখেছিলেন মানুষটা মাটিতে পড়ে আছেন। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে।

আন্টির চিৎকারে ছুটে এসেছিল আশেপাশের সবাই, সেই সবার মধ্যে পাশের বাড়ির ওরাও ছিল। মোড়ের ফার্মেসি থেকে ডাক্তার এসে পালস পায়নি, চোখের মণির ওপরে টর্চের আলো ফেলে দেখেছিল নিষ্প্রাণ মণির নাড়াচাড়ার অনুপস্থিতি।

ক্লাস সেভেনের মীরা সেদিনই জেনেছিল, মরে গেলে মানুষের চোখের মণিতে আলো ফেললেও মণির কোনো হেলদোল হয় না। এসবই আজ থেকে দু-বছর আগের ঘটনা।

দু-বছর আগে আচমকা হার্ট অ্যাটাকে বাবা মারা যাওয়ার পর বাসার বড় ছেলে হওয়ায় সংসারের হাল ধরতে হয়েছে শিহাব ভাইয়াকে। আর দিনে দিনে যোগাযোগ কমেছে দুই পরিবারের।

ওদের বাড়িটা তিন তলা ফাউন্ডেশন দেওয়া। ছাদের ওপরে তিনতলার কাজ শুরু করার পরপর মারা গিয়েছিল শিহাব ভাইয়ার বাবা।

আর পালটে গিয়েছিল সব হিসাবনিকাশ। বাড়ির কাজ আর শেষ করা হয়নি, ডিগ্রি কলেজের পড়া স্থগিত রেখে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল শিহাব ভাইয়াকে।

জানা গিয়েছিল অফিসের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে বড় অঙ্কের টাকা লোন নিয়ে বাড়ির কাজে হাত দিয়েছিলেন শিহাব ভাইয়ার বাবা; তাতেও কুলায়নি বলে গ্রামের বাড়ির সম্পত্তিতেও তাঁর অংশ ভাইদের কাছে বিক্রি করে নগদ টাকা এনেছিলেন। আর তাই তাঁর মৃত্যুর পর কারো কাছ থেকে, কোথাও থেকে কোনো পাওনা টাকা পাওয়ার কথা ছিল না তাঁর পরিবারের।

আঙ্কেলের মৃত্যুর পর কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন আন্টি, সবটা জানার পর চোখের জল শুকিয়ে গেল তাঁর। মরাবাড়িতে আসা অতিথিরা কী খাবে সেই বন্দোবস্ত না করেই উঠোনে বাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইলেন চুপ করে, আকাশ পানে দৃষ্টি মেলে।

পরে মীরার আম্মুই খাবার পাঠিয়েছিল মীরাদের বাসা থেকে, অতিথিদের সামলে সুমলে ম্যানেজ করে খাইয়েছিল মীরার আম্মুই।

এখন শিহাব ভাইয়াদের বাড়ির সামনে যে বড় উঠোনটা, যেখানে বাগান করার কথা ছিল আঙ্কেলের, পরিকল্পনা ছিল গেটের সামনে উঠিয়ে দেবেন

বাগানবিলাস আর মাধবীলতার ঝাড়, সেখানে এখন ছোট ছোট কয়েকটা টিনশেড ঘর তোলা হয়েছে। সেই ঘরগুলোতে এখন কয়েক ঘর ভাড়াটিয়া থাকে।

সেই ভাড়াটিয়ারা বেশিরভাগই কামলা শ্রেণির। উঠোনের এক মাথায় কমন বাথরুম, আরেক মাথায় কলপাড়।

সেই কলপাড় আর বাথরুমের সিরিয়াল নিয়ে চলে নিত্য ক্যাচম্যাচ। ফলাফল যে উঠোন জুড়ে ফুলেদের হাওয়ার সাথে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খেলা করবার কথা ছিল, সেখানে এখন প্রতি সকালে চলতে থাকে গালাগালির গুলিবর্ষণ।

এখন আর শিহাব ভাইয়ার গায়ে থাকে না প্রবাসী চাচার এনে দেওয়া সাদা ধবধবে টি-শার্ট, আর হালফ্যাশনের জিন্সের প্যান্ট। দাগ লাগা মলিন গেঞ্জি আর দর্জির দোকান থেকে কাপড় কিনে সস্তায় বানানো গ্যাভার্ডিন কাপড়ের প্যান্টে শিহাব ভাইকে এখন বড় বেশিই ম্রিয়মাণ মনে হয়।

বড় রাস্তার ওপরে যে মনোহারী দোকানটা, সুরমা স্টোরস, সেটা শিহাব ভাইয়ার। সকাল দশটায় গিয়ে দোকান খোলে সে।

মাঝে মাঝে কোনো কোনো শুক্রবার, এমনি কোনো ছুটির দিন স্কুল না থাকলে যদি ওদের এমন কিছু কেনার থাকে যেটা এই মোড়ের মুদি দোকানে পাওয়া যায় না, এই যেমন নীরা আপুর নেল পালিশ কিংবা রিমুভার কিংবা মীরার পাঞ্চ ক্লিপ কিংবা বাহারি ডায়েরি, তা হলে শিহাব ভাইয়ার দোকানে যায় ওরা। শিহাব ভাইয়া এখন আর তার দোকানে গেলে ফ্রি চকলেট খাওয়ায় না।

বাসার চকলেট থেকে চকলেট খাওয়ানো যায়, দোকানের টাকায় কেনা হিসেবের চকলেট থেকে ফ্রি চকলেট সাধা যায় না। বোধ হয় সেই লজ্জাতেই নুয়ে থাকে শিহাব ভাই।

কিন্তু মলিন গেঞ্জি পরা, সংসারের হাল ধরতে গিয়ে ডিগ্রি কলেজের পড়া শেষ করতে না পারা শিহাব ভাইয়ার সাথে ঝকঝকে হালফ্যাশনের ড্রেস পরা নিখুঁত সুন্দরী নীরা আপুর কিছু হওয়ার নয়। দুজনের মেলে না।

না শিক্ষায়, না পরিবারে, না অর্থে, না সামাজিক অবস্থানে। শিহাব ভাইয়ার ছোট বোন সোনিয়ার বিয়ে হয়েছে গ্রামের দিকে, মীরাদের দাদার বাড়ি আর জমিজমা থেকে খুব বেশি দূরে নয় সেটা।

সিজনের সময় সোনিয়ার বর মীরার দাদার জমিতে বর্গা চাষ করে। বাবামরা মেয়ের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কীইবা সম্বন্ধ আসার কথা ছিল!

সোনিয়ার বিয়েতে দাওয়াত দিয়েছিল ওদের, সোনিয়ার বর কী করে জানার পর কেউই যায়নি ওরা। সামান্য বর্গা চাষির বিয়েতে যাওয়া মানায় না ওদের।

তবে মীরার আম্মু বোধহয় মনে মনে পছন্দ করে শিহাব ভাইয়ার মাকে, আগের সখ্য ভুলে যেতে পারেনি এখনো। কাউকে না জানিয়ে মীরার আম্মু সোনিয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল কানের এক জোড়া মাকড়ি।

মীরার হাত দিয়েই পাঠিয়েছিল, তাই ও জানে। বাসার আর কারো মনে হয় জানা নেই এই ঘটনা।

নীরা আপুকে দেখলেই ঝড়ো হাওয়ার মুখে পড়া প্রজাপতির পাখার মতো তিরতির করে কাঁপতে থাকে শিহাব ভাইয়ার ভেতরটা, চলমান লোহার টুকরোর সামনে ঘূর্ণায়মান কম্পাসের কাঁটার মতো ঘুরতে থাকে, খুব করে টের পায় মীরা। ছোট হলে কী হবে, খুব ছোট তো নয় সে।

ছোট চাচার বইয়ের টেবিল থেকে না বলে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেলেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টান', 'ভালোবাসা প্রেম নয়' আর বুদ্ধদেবের 'তিথিডোর'। খুব বোঝে সে এগুলো।

এই যে সাতসকালে উঠে শিহাব ভাইয়ার দাঁড়িয়ে থাকা আপুর প্রতীক্ষায়, এটাও বেশ লাগে মীরার। ভাবতে ভালো লাগে কোনো একদিন তার জন্যেও এমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে কেউ।

আচ্ছা তখন কি মীরা ফিরে তাকাবে! নাকি নীরা আপুর মতোই সগর্বে হেঁটে চলে যাবে না দেখার ভান করে!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবশ্য কোনো আশা দেখে না সে। এমন গোল মুখের মেয়ের জন্য কে-ই বা দাঁড়িয়ে থাকবে, কার দায় পড়েছে!

চলার গতি বাড়িয়ে দিল মীরা, স্কুলের অ্যাসেম্বলির সময় হয়ে এল বলে। দেরি করে ঢুকলে আবার কথা শুনতে হবে।

পা চালিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সেই সকালে অকারণেই সিদ্ধান্ত নিল মীরা– কোনো একদিন কেউ যদি তাকে ভালোবাসার কথা বলেও, সে তাকে খুব নিষ্ঠুরের মতো ফিরিয়ে দেবে। কোনো একদিন কাউকে অকারণেই খুব দুঃখ দেবে মীরা।

কেন দেবে? সেটা নিজেও ঠিক করে বলতে পারবে না সে।

আর সব কেনর কি উত্তর থাকে?